যুগান্তর

তারিখ 20 JAN 2016

মাসুদ : বিনা চিকিৎসায় মারা যায়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ফেটে গিয়েছিল। মূলত লাঙস ফেটে যাওয়ার কারণেই সে মারা যায়। এছাড়া পায়ের গোড়ালির আঘাতে বোঝা যায়, সে উঁচু স্থান থেকে পড়ে যায়।' পোস্টমর্টেম রিপোর্ট প্রস্তুতকালে মাদ্রাসার দু'জন প্রতিনিধি ছিলেন বলেও জানান ডা. রানা।'

এদিকে মাদ্রাসার শিক্ষক সচিব মুফতি শামসুল হক এ ঘটনায় ১৬ জানুয়ারি রাত আড়াইটায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। সেখানে কারও নাম উল্লেখ করা হয়নি। আসামিরা সবাই অজ্ঞাত। এ বিষয়ে জানতে চাইলে জামিয়া ইউনুছিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মুফতি মোবারক উল্লাহ মঙ্গলবার যুগান্তরকে বলেন, 'পুলিশ আমাদের জানিয়েছে, মামলায় আসামিদের নাম উল্লেখ করলে ঝামেলা আরও বাড়বে। কারণ প্রতিপক্ষের মামলায় আপনাদেরও আসামি করা হবে। এ অবস্থায় হয়রানি থেকে বাঁচতে এবং সার্বিক পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ রাখতে মামলায় কারও নাম উল্লেখ করা হয়নি।' তিনি বলেন, 'মাদ্রাসায় ঢুকে নিরীহ ছাত্রদের ওপর পুলিশের হামলার ঘটনার জন্য আইনশৃংখলা বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে দুঃখ প্রকাশ করা হয়।' এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আমাদের প্রথম এজাহারে পুলিশের এএসপি তাপস রঞ্জন ঘোষ ও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আকুল চন্দ বিশ্বাস, বিজয় টেলিকমের মালিক রনি ও ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মাহমুদুল হক ভূঁইয়াসহ ১৪ জনের নাম দিয়েছিলাম। তখন পুলিশের পক্ষ থেকে এদের নাম তদন্তের আওতাভুক্ত করা হবে বলে আশ্বাস দেয়া হয়।' প্রসঙ্গত, পুলিশের যে দু'জন কর্মকর্তাকে প্রথম এজাহারে অভিযুক্ত করা হয় ১২ জানুয়ারি রাতে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষকদের অনুষ্ঠিত বৈঠকে তাদের ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে প্রত্যাহার করা হয়।

অন্যদিকে নিহত মাসুদুর রহমানের পরিবারকে দেড় লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেয় পুলিশ প্রশাসন। এ বিষয়ে মাদ্রাসা অধ্যক্ষ মুফতি মোবারক উল্লাহ বলেন, স্থানীয় পুলিশের পক্ষ থেকে ৫০ হাজার ও আইজিপির পক্ষ থেকে ১ লাখ টাকা দেয়া হয়। এর আগে সোমবার রাতে মামলার বাদী মুফতি শামসুল হক যুগান্তরকে বলেন, 'আমরা শান্তি চাই। দেশে যেন আর ফেতনা না বাড়ে সেজন্য হরতালসহ অন্যান্য কর্মসূচি প্রত্যাহার করি। প্রশাসনের পক্ষ থেকে যে দেড় লাখ টাকা দেয়া হয় তা পরিবারের কাছে হস্তান্তর করে শান্তিপূর্ণ অবস্থানের কথা জানানো হয়েছে। আমরা চাই না ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আরেকটা ৬ ফেব্রুয়ারি সৃষ্টি হোক। কেননা ২০০১ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি কওমি মাদ্রাসা ছাত্রদের সঙ্গে আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সংঘর্ষে ৬ মাদ্রাসা ছাত্র মারা যায়।'

সোমবার রাতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌর এলাকার ভাদুঘর গিয়ে কথা হয় তার বড় ভাই মাওলানা মামুনুর রশীদের সঙ্গে। জানা যায়, তাদের বাবা নেই। তিনি এবং তার মা ও অপর দুই ভাইসহ পরিবার-পরিজন নিয়ে এই বাড়িতে আছেন ৪ বছর ধরে। নিহত মাসুদসহ তারা তিন ভাই মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেছেন। ঘটনার দিন মামুনুর রশীদ ঢাকায় ছিলেন। এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ১১ জানুয়ারি মাদ্রাসায় গোলযোগের খবর পেয়ে রাত ১০টার দিকে মাসুদকে ফোন করেন তিনি। এ সময় তাকে মাসুদ জানায়, 'আমি মাদ্রাসায় নিরাপদে আছি। যাতে টিয়ারশেলের ঝাঁজ থেকে বাঁচতে আগুন ধরিয়ে তাপ দিচ্ছি।' এরপর রাত ১১টার কিছু আগে আবার ফোন দিলে ফোনকলটি অপর একজন রিসিভ করে বলেন, পুলিশের নির্যাতনে মাসুদ আহত হয়েছে। তাকে এক জায়গায় রাখা হয়েছে। বাইরে পুলিশি ব্যারিকেড থাকায় হাসপাতালে নেয়া যাচ্ছে না। এরপর থেকে মাসুদের মোবাইল ফোনটি বন্ধ পাওয়া যায়। রাত তিনটার দিকে তার মৃত্যুর সংবাদ পাই।' এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আমরা আশা করি, এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত হবে। মাদ্রাসার হুজুররা যা সিদ্ধান্ত নেবেন তাই তারা মেনে নেবেন। এ দুনিয়ায় বিচার না হলেও আখেরাতে এর বিচার নিশ্চয়ই হবে। তিনি বলেন, 'আমার মা বিচার চান না। তিনি আল্লাহর কাছে বিচার দিয়েছেন।' ক্ষতিপূরণের দেড় লাখ টাকার বিষয়ে মামুন বলেন, 'আমরা টাকা নেইনি। মাদ্রাসাতেই টাকা আছে। মামলার পরিস্থিতি দেখে টাকা নেয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেব।'

এদিকে যে তুচ্ছ ঘটনায় যাদের নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এত বড় সংঘাতের ঘটনা ঘটেছে ১২টি মামলায় তাদের কারও নাম নেই। ১১ জানুয়ারি কওমি ছাত্র ঐক্য পরিষদের সেক্রেটারি খালেদ মো. মোশাররফ ও জেলা পরিষদ মার্কেটের বিজয় টেলিকম নামের একটি মোবাইল দোকানের মালিক রনির মধ্যে কথা কাটাকাটি নিয়ে ঘটনার সূত্রপাত। দু'জনই আছেন প্রকাশ্যে। সোমবার রাতে জেলা পরিষদ মার্কেটে বিজয় টেলিকম নামে দোকানে গিয়ে কথা হয় মালিক রনি আহমেদের সঙ্গে। ঘটনার সূত্রপাত নিয়ে যুগান্তরকে তিনি বলেন, '১১ জানুয়ারি বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে জেলা পরিষদ মার্কেটের সামনে দু'জন মাদ্রাসা ছাত্র ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার ভাড়া নিয়ে বয়স্ক চালককে মারধর করার জন্য উদ্যত হলে আমি সেখানে গিয়ে তাদের ফিরিয়ে দিই। এ নিয়ে দুই মাদ্রাসা ছাত্রের সঙ্গে আমার তর্কাতর্কি হয়। এ সময় একজন নিজেকে কওমি ছাত্র ঐক্যের সেক্রেটারি পরিচয় দিয়ে দেখে নেয়ার হুমকি দেন। এরপর ওইদিনই সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে আমি দোকানে বসা থাকাবস্থায় ২ থেকে তিনশ' মাদ্রাসা ছাত্র দোকানে এসে একযোগে হামলা চালায়। তারা ভাংচুর ও লুটপাট চালায় এবং ক্যাশসহ কয়েকজনকে মারধর করে। এ সময় রনি ওই হামলার একটি ভিডিও ক্লিপ প্রতিবেদকের হাতে দেন। এতে দেখা যায়, বিক্ষুব্ধ মাদ্রাসা ছাত্ররা দোকানের সামনের অংশে জটলা তৈরি করে একজনকে মারধর করছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ওই ঘটনার পর জেলা পরিষদ মার্কেটের ব্যাবসায়ীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে এগিয়ে এলে দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়। এর সঙ্গে যোগ দেয় স্থানীয় ছাত্রলীগের একটি অংশ। ছাত্রলীগ কেন এ ঘটনায় যুক্ত হয়ে মাদ্রাসা ছাত্রদের সঙ্গে সংঘর্ষে অংশ নেয়— এর কারণ খুঁজতে গিয়ে জানা যায়, জেলা ছাত্রলীগের সহসম্পাদক রানা আহমেদ বিজয় টেলিকমের মালিক রনি আহমেদের ছোট ভাই। এ কারণে তিনি ছাত্রলীগের একটি অংশ নিয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। এরপর দফায় দফায় হামলা-পাল্টা হামলার ঘটনা ঘটে। ব্যবসায়ীসহ ছাত্রলীগের একটি অংশের হামলায় মাদ্রাসাসহ মসজিদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরপর আরও উত্তেজিত হয়ে মাদ্রাসা ছাত্ররা বের হয়ে টিএ রোড বন্ধ করে বিক্ষোভ চালায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে টিয়ারশেল ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে। একপর্যায়ে মাদ্রাসা ছাত্রদের ধাওয়া করে মাদ্রাসা রোডে নিয়ে যায়। এরপর ত্রিমুখী সংঘর্ষে এলাকা রণক্ষেত্রে রূপ নেয়।

এ সময় মাদ্রাসার মসজিদের মাইকে 'আওয়ামী সন্ত্রাসীরা মাদ্রাসায় হামলা করেছে যার যা কিছু আছে তা নিয়ে মাদ্রাসা রক্ষায় এগিয়ে আসুন— এটা আপনাদের ঈমানী দায়িত্ব' বলে আহ্বান জানালে এলাকার ছাত্রদলের নেতাকর্মীসহ এলাকাবাসী সংঘর্ষে যোগ দেয়। এই ত্রিমুখী সংঘর্ষে ২৫ পুলিশসহ প্রায় অর্ধশত লোক আহত হয়। থেমে থেমে এ সংঘর্ষ চলে রাত সাড়ে ১০টা পর্যন্ত। এ হামলা ও পাল্টা হামলা প্রসঙ্গে মুফতি শামসুল হক বলেন, সংঘর্ষ একপর্যায়ে থেমে এলে মাদ্রাসার শিক্ষকরা ছাত্রদের মাদ্রাসার ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়। রাত ১১টার দিকে পুলিশ বিভিন্ন দিক থেকে মাদ্রাসা ও আবাসিক হলে অতর্কিত ঢুকে ছাত্রদের ওপর নির্যাতন চালায়। এ সময় নির্মাণাধীন ৪ তলা ভবন থেকে হাফেজ মাসুদকে পিটিয়ে আহত করে নিচে ফেলে দেয়। সেদিন মাদ্রাসার দায়িত্বে থাকা শিক্ষক আবদুর রহিম কাশেমী যুগান্তরকে বলেন, 'নিহত মাসুদকে নির্মাণাধীন ভবনের পূর্বদিকে ফেলে দেয়ার পর তার কান্নার গোঙানির শব্দ পেয়ে পাশের বাসার কয়েকজন গৃহবধূসহ ওই বাড়িতে আশ্রয় নেয়া মাদ্রাসা ছাত্ররা মাসুদকে উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়ার ব্যবস্থা করে। কিন্তু তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে হাসপাতালে নেয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু বাইরে পুলিশ ব্যারিকেড রাখায় সময়মতো তাকে হাসপাতালে নেয়া যায়নি।'

১২ জানুয়ারি মাসুদুর রহমানের মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে শহরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ফজরের নামাজের পর থেকেই শুধু ইউনুছিয়া নয়, শহর ও আশপাশের বিভিন্ন মাদ্রাসা থেকে শত শত ছাত্র-শিক্ষক শহরে এসে জমায়েত হতে থাকে। সকাল ৭টার পর খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে মাদ্রাসা ছাত্ররা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রধান প্রধান শহরে অবরোধ সৃষ্টি করে। তারা সরকারবিরোধী বিভিন্ন স্লোগান দিয়ে উত্তপ্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে। একপর্যায়ে তারা শহরের বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগ ও অঙ্গসংগঠনের সব ধরনের তোরণ, ব্যানার, ফেস্টুন, পোস্টার ভাংচুর করে। এছাড়া তারা শহরের পৌর আধুনিক সুপার মার্কেটের সামনে বঙ্গ সংস্কৃতি উৎসবের গেট ও শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ভাষা চত্বরের বঙ্গ সংস্কৃতি উৎসবের গেটও ভাংচুরে অংশ নেন। সকাল ১০টার দিকে মাদ্রাসা ছাত্ররা শহরের রেলগেট এলাকায় রেললাইনে গাছের গুঁড়ি ফেলে অবরোধ তৈরি করে। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা এ সময় রেললাইনে আগুন ধরিয়ে লাইনের নাটবল্টু খুলে ফেলে। কোথাও কোথাও রেললাইন উপড়ে ফেলা হয়। এই মিছিল থেকেই হামলা চালানো হয় রেলস্টেশনে। স্টেশনে বেশ কিছু সময় নিয়ে নারকীয় তাণ্ডব চালায় মাদ্রাসা ছাত্ররা। তারা একযোগে স্টেশন মাস্টার ও সহকারী মাস্টারের কক্ষসহ কম্পিউটার কক্ষে ব্যাপক ভাংচুর চালানো হয়। বিশেষ করে সিগন্যাল বোর্ড, কম্পিউটার, টেলিফোন তছনছ করে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়। দুপুর ১২টার দিকে মাদ্রাসা ছাত্রদের একটি মিছিল শহরের শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ভাষা চত্বরে তাণ্ডব শুরু করে। তারা এ সময় তিতাস সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ, শিশু নাট্যম, সাহিত্য একাডেমি, তিতাস ললিতকলা একাডেমি, শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতি পাঠাগার এমনকি ধীরেন্দ নাথ দত্তের নামফলকও ভাংচুর করে। ভাংচুর শেষে মিছিলকারী মাদ্রাসা ছাত্ররা জেলা শিল্পকলা একাডেমি, শহরের হালদারপাড়ার মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক অ্যাড. আলী আজম ভূঁইয়ার বাড়িতে চড়াও হয়। আলী আজম ভূঁইয়ার বাড়িতে থাকা জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয় ভাংচুরসহ পাশের প্রশিকা কার্যালয় ও ব্যবসায়ী ফেরদৌসের পর্দার গুদামে আগুন ধরিয়ে দেয়। মুহূর্তের মধ্যে আগুনে সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এ জায়গায় তাণ্ডব শেষে মিছিলটি শহরের পুরাতন জেল রোডে বিশ্ববিশ্রুত সুর সম্রাট ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর স্মৃতিধন্য সুর সম্রাট আলাউদ্দিন খাঁ সঙ্গীতাঙ্গনে ব্যাপক ভাংচুর শেষে আগুন ধরিয়ে দেয়। আগুনে এ সঙ্গীতাঙ্গনের কয়েকটি কক্ষ ও ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ স্মৃতি জাদুঘর পুড়ে যায়। বিকাল ৪টায় সদর থানার অদূরে পুলিশের একটি গাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে মাদ্রাসা ছাত্ররা। একই সময়ে জেলা সদর হাসপাতালে ব্যাপক ভাংচুর চালানো হয়।

১৩ জানুয়ারি জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আল মামুন সরকার ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রেস ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশের বিরুদ্ধে নীরবতা ও নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ করেন। এ বিষয়ে তিনি বলেন, প্রশাসন ও পুলিশকে বারবার বলা হলেও তারা কোনো প্রতিষ্ঠান রক্ষায় এগিয়ে আসেনি। স্থানীয় সংসদ সদস্য র আ ম. উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরীসহ সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটসহ বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে একই অভিযোগ করা হয়।

এদিকে উল্লেখিত অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে ভারপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার এমএ মাসুদ যুগান্তরকে বলেন, 'আমাদের নিজস্ব ফোর্স দিয়ে নিজস্ব স্থাপনা, ফায়ার সার্ভিস, ডিসি অফিস, এসপি অফিস, দুটি ফাঁড়ি, গ্যাসফিল্ডসহ বিভিন্ন সরকারি অফিস-আদালত রক্ষা করার চেষ্টা করেছি।' তিনি বলেন, 'আমাদের কাছে তথ্য ছিল যেহেতু পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তাই এসব প্রতিষ্ঠানে হামলা হতে পারে। কিন্তু অতর্কিতভাবে রেলস্টেশন ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলো আক্রান্ত হয়েছে।' এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'মাদ্রাসা ছাত্র হাফেজ মাসুদুর রহমান পুলিশের নির্যাতনে মারা যায়নি। পুলিশের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ সঠিক নয়। পুলিশি নির্যাতনে মারা গেলে পোস্টমর্টেম রিপোর্টে তা বেরিয়ে আসবে।'